IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

PARTITION IN NOVELS OF SHAKTIPADA RAJGURU: HISTORY OF INSULTING DISPLACED PERSONS

সত্যা দেবনাথ (Satya Debnath)

Ph.D Scholar(NET JRF), Assam university,
Department of Bengali

ABSTRACT

From September 19, 1945 to August 15, 1947, Indians no longer had to fight against the British, because the British government announced that the British would not delay the transfer of power if the Indians reached a consensus among themselves on how to transfer power. After this, the Indians started fighting among themselves. However, the seeds of this fight had already been planted. The Indians who forgot their religious differences and fought against the British with a smile on their faces, those Indians indulged in the game of giving and taking their lives for their own interests- which is a very shameful history. Finally, in August 1947, the country became independent, but this independence was torn apart by dragging the motherland.

Literature will not be written about such a big event as partition, it cannot be. A lot of literature has been written about this partition and refugee people in both the countries of India (West Bengal) and Opar Bangladesh. Bengali famous writer Shaktipad Rajguru (1922-2014) in his novels 'Dandaktheke Morichjhanpi', 'Tabu Bihang' (1960), 'Meghe Dhaka Tara' (1962) realistically highlighted the issue of partition and refugees. Shaktipad Rajguru was not a refugee himself but he visited the refugee campus day after day, witnessed their struggles and recorded them in his novels. In the novel 'Dandakatheke Morichjhanpi' we see that the suffering of the scattered people from East Bengal is endless. The background of the novel 'Tabu Vihanga' is about the people of Gopalpur village under Durgapur of Radhabanga, Burdwan district and various refugee campus and campus along the banks of Damodar river. In the novel 'Meghe Dhaka Tara' (1962) we see a poor school master who is a refugee from Pirganj and comes to this country with his wife and four children. The life struggle of a family is mainly shown here as a representative of the refugees.

KEYWORDS: Partition, Shaktipada Rajguru, displaced person, Dandaktheke Morichjhanpi, Tabu Bihang, Meghe Dhaka Tara.

Discussion:

শক্তিপদ রাজগুরুর উপন্যাসে দেশভাগ: বাস্তুহারাদের লাঞ্ছনার ইতিকথা

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল তখন সেটা ছিল দেশ মায়ের প্রতি পবিত্র ভালোবাসার অর্ঘ্য, তখন সেখানে কোনো স্বার্থপরতা ছিল না। দেশ মাতৃকাকে শৃংখল মুক্ত করতে যারা নিজের প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন সেখানেও ছিলনা কোনো স্বার্থের গন্ধ। পরবর্তীকালে এই পবিত্র ধারায় এল কালিমা। সবাই যে স্বার্থপর ছিল তা নয়, কিন্তু কিছু মানুষের স্বার্থপরতা, মূর্খতা ও অদূরদর্শিতার জন্যই ভারতবাসী এত বছরের কাঙ্খিত স্বাধীনতা পেলেও তা ছিল কালিমালিপ্ত ও খন্ডিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন দূরদর্শী তাই স্বাধীনতার অনেক বছর আগেই তিনি দেশভাগের মতো খারাপ কিছুর ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন-

> "একটা বড় আশ্চর্য জিনিস দেখেছি এই বাংলাদেশে, যে সব পুরুষ এখানে দেশনেতাদের সম্মান লাভ করেন, নিম্নশ্রেণির মেয়েদের মতো ঘর ভাঙাভাঙির খেলাকেই তাঁরা উচ্চ রাজনীতি বলে ঘোষণা করেন। ... এখানকার লোকে তাই তিলে তিলে কিছু গড়ে তুলবার জন্য দল বাঁধে না, দল বাঁধে গড়া জিনিসকে ভাঙবার পৈশাচিক আনন্দে। এ জিনিসকেও ক্ষমা করা যেত, যদি না দেখতাম পিছনে ব্যক্তিগত স্বার্থবুদ্ধি তার দ্রংষ্টা বের করে আছে। ... এই সর্বনাশা প্রবৃত্তি দিনে দিনে প্রবল হয়ে উঠেছে বাংলাদেশে, বুদ্ধির অভাব বশতঃ নয়, এর মধ্যে দুর্বুদ্ধি আছে, আছে শয়তানি। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রে অসাধুতা তার জয়পতাকা তুলেছে; স্বার্থবুদ্ধি এবং স্বেচ্ছাচার সকল কল্যাণকে করেছে বিনিষ্ট। ... তারা নামে এবং মহিমায় যেই হোক, আসলে দেশের শত্রু। ... আমাদের বাঁচবার কোন পথই নেই।"[১]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশপ্রেমীর মুখোশের আড়াঁলে লুকিয়ে থাকা শয়তানদের চিনতে পেরেছিলেন কিন্তু ভারতবাসী তাদের চিনতে অনেক দেরি করেছিল। সেই মুষ্টিমেয় কিছু স্বার্থপর মানুষদের জন্যই ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে দেশমাতৃকাকে টুকরো করে তার বিনিময়ে মানুষ স্বাধীনতা পেল।

১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দের ১৯ সেপ্টম্বর থেকে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৫ আগস্ট পর্যন্ত সময়কালে ভারতবাসীর আর ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হয়নি, কারণ ইংরেজ সরকার ঘোষণা করেছিল ক্ষমতা হস্তান্তর কীভাবে হবে তা ভারতবাসী নিজেদের মধ্যে ঐক্যমতে পৌঁছালে ক্ষমতা হস্তান্তরে আর দেরি করবে না ইংরেজ। এর পরই শুরু হলো ভারতবাসীর নিজেদের মধ্যে লড়াই। যদিও এই লড়াইয়ের বীজ আগে থেকেই পোঁতা হয়ে গিয়েছিল। যে ভারতবাসী ধর্মের বিভেদ ভুলে নিজেদের প্রাণ তুচ্ছ করে ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে, হাসিমুখে প্রাণ দিয়েছে, সেই ভারতবাসী

নিজেদের স্বার্থের কথা ভেবে প্রাণ দেওয়া-নেওয়া খেলায় মেতে ওঠে- যা খুবই লজ্জার ইতিহাস। সবশেষে ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে দেশ তো স্বাধীন হলো কিন্তু দেশমাতৃকাকে টেনে হিঁচড়ে টুকরো করে এলো এই স্বাধীনতা। দেশভাগ হয়ে গেল ধর্মের ভিত্তিতে। শুধু দেশভাগ হয়েই সমস্যার সমাধান হলো না। পূর্ববঙ্গে হিন্দুরা আর থাকতে পারল না নিরাপদে। সব ছেড়ে শুধু প্রাণ হাতে করে সবাইকে চলে আসতে হল পশ্চিমবঙ্গে, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ থেকেও মুসলিমরা অনেকেই চলে গেল পূর্ববঙ্গে-

> "সীমানা কমিশন এইভাবে খাড়া লাইন টেনে ভাগ করেছেন ভারতবর্ষকে। এর পরিণাম ক্ষতবিক্ষত হয় দেশ, অগণিত নর-নারী এপার থেকে ওপারে চলে যান। অসংখ্য মানুষ ওপারের ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসেন এপারে। প্রায় দু'লক্ষ মানুষের প্রাণ যায়। লাঞ্ছিতা হন তার চেয়েও বেশি সংখ্যক নারী। লক্ষ লক্ষ মানুষ উদ্বাস্তু হয়। হত্যা, রক্তপাত, নারীহরণ আর নির্যাতন হাত ধরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারতবাসী লাভ করে এক খন্ডিত স্বাধীনতা।"[২]

দেশভাগের মতো এত বড়ো একটি ঘটনা নিয়ে সাহিত্য রচিত হবে না তা তো হতে পারে না। লেখকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার কথা সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে ছোটগল্প, প্রবন্ধ ও নাটকে-

> "১৯৪৬-১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের কলকাতা নোয়াখালী বিহারের দাঙ্গায় হাজার হাজার মানুষের মৃত্যু এবং হাজারে হাজারে গৃহচ্যুত স্বজন হারানো আহত মানুষগুলির কথা ও সাত চল্লিশের বঙ্গবিভাগ তথা ভারত ভাগে ছিন্নমূল হয়ে যাওয়া মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রভাব ফেলবে না এমন হতেই পারে না। অন্যান্য ভাষায় যেমন পাঞ্জাবি, উর্দুর মতো প্রত্যক্ষ ও প্রকট বাস্তবতার ছবি এখানে না থাকলেও বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে দাঙ্গা ও দেশ ভাগ এসেছে নানা ভাবে।"[৩]

এপার বাংলা ওপার বাংলা দুই দেশেই এই দেশভাগ ও উদ্বাস্তু মানুষের দের নিয়ে অসংখ্য সাহিত্য রচিত হলেও উচ্চমানের শৈল্পিক উৎকর্ষ সম্পন্ন রচনা কম ছিল। তবে সবাই মানুষের কথা বলেছেন, মানুষের দুঃখ যন্ত্রণার ছবি এঁকেছেন, মানুষের জীবন সংগ্রাম দেখিয়েছেন। সেই দিক থেকে অল্পস্বল্প শিল্পগুণ লঙিঘত হলেও সব রচনাগুলি পাঠকের কাছে কম বেশি সমাদৃত হয়েছে।

ইংরেজরা কৌশলে হিন্দু মুসলিমদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে দেয়, তাদের কানে সাম্প্রদায়িকতার বিষমন্ত্র দিয়ে দেয়, উস্কানিমূলক কথা বলতে থাকে। আর এই চক্রান্ত না বুঝে মূর্খের মতো শাসকগোষ্ঠীর এই চক্রান্তের শিকার হয় সর্বভারতীয় নেতৃবৃন্দ। একদিকে কংগ্রেসের স্বাধীন বঙ্গভূমি করার স্বপ্ন আর অন্যদিকে মুসলিম লিগের 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নিয়ে মুসলিম নেতৃত্ব

উত্তাল। এভাবেই ভারতের এই দুই প্রধান ধর্মের মানুষ ধীরে ধীরে হয়ে যায় একে অপরের শত্রু। যার অনিবার্য পরিণতি দেশভাগ আর শুধু দেশভাগ নয়, যার অন্তিম পরিণতি হাজার হাজার উদ্বাস্তু। কত আবেগ, কত ভালোবাসা নিয়ে মানুষ একটা বাড়ি, একটা গ্রাম, একটা দেশে বাস করে; হঠাৎ করে সব ছেড়ে শূন্য হাতে শুধু বাড়ি ছেড়ে নয়, গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে নয়, নিজের দেশকে ছেড়ে যেতে হয়েছিল অন্যদেশে নিঃস্ব অসহায় অবস্থায়। সেই মানুষগুলোর কষ্টের কথা বর্ণনাতীত। এ প্রসঙ্গে মণিকুন্তলা সেনের বক্তব্য-

> "এটা প্রমোদ ভ্রমণ নয়। পাশের গ্রামে ক'দিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া নয়। ভারতীয় বা পাকিস্তানি যেই হো'ক সংসারের পাঠ চুকিয়ে এক মুলক থেকে আর এক মুলুকে চলেছে ওরা। ঘর-বাড়ি, জোত জমি ফেলে হতাশ মানুষের দল মাইলের পর মাইল হেঁটে চলেছে আর ফিরবে না বলে। এই পথ চলার ওদের সর্বক্ষণের সঙ্গী হল রোগ, ব্যাধি ক্ষুধা তৃষ্ণা। আরও কত বা বাঁধা আছে যা প্রতিকার করার সামর্থ্য তাদের নেই।"[৪]

মানুষ যখন যাযাবর ছিল তখন ছিল আলাদা কথা, তখন মানুষ ঘুরে ঘুরে বেঁচে থাকাতে জীবনের সুখ ও সুবিধা খুঁজে পেত। সমাজে স্থায়ীভাবে বাস করার পর মানুষ যাযাবর জীবন যাপনকে ভয় পেতে শুরু করে। তারপর দেশভাগের সময় আবার সেই যাযাবরের মতোই তাদের এক দেশ থেকে অন্য দেশে যেতে হয়েছিল অসহায়ের মতো। সর্বস্ব দিয়ে, সম্মান দিয়েও তারা একটু নিরাপদ আশ্রয় পায়নি। ধর্মের মোড়কে কিভাবে মানুষগুলোর মানবিকতা লোপ পেয়েছিল, সেই মানবিকতা লোপ পাবার কথা উঠে এসেছে বিভিন্ন গল্প-উপন্যাসে। সুমিতা চক্রবর্তী কথায়-

> "১৯৪৭- এ রাষ্ট্রিক বিভাজন হয়ে উঠল মানববিধ্বংসী নিষ্ঠুরতার চলচ্চিত্র। পশ্চিম পাঞ্জাব আর পূর্ব বাংলা থেকে হাজারে হাজারে মানুষ অজানা অঞ্চলকে স্বধর্মের নিরাপদ ভূমি জেনে পূর্বপুরুষদের বাসভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হল। সেই ত্যাগের মধ্যে কোনো মহিমা ছিলো না। বিতাড়িত পশুর মতোই ছিলো সেই স্থানান্তরে যাওয়ার বাধ্যতা। দুই মুখেই প্রবাহিত পুঞ্জিত ঘৃণা আর বিরূপতার আবৃত করেছিল মানবতাবোধকে।"[৫]

পশ্চিমবঙ্গের মানুষ উদ্বাস্তুদের ভালোভাবে নেয়নি। সেই নিরুপায় অসহায় মানুষদের দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়নি। তবে সরকার তো চেষ্টা করেছে মানুষগুলোকে আশ্রয় ও খাবার দিতে কিন্তু সংখ্যাটা এত বেশি হয়ে গিয়েছিল যে সরকার পরিস্থিতিকে সামলে উঠতে পারেনি আর মানুষ এই হলো মানুষের প্রধান শত্রু। দেশভাগের পর এটা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। তাইতো সরকারের সাহায্য সাধারণ মানুষদের হাতে পৌঁছানোর আগে দালালরা এর মুনাফা নিত। সরল মানুষগুলো দালালদের বিশ্বাস করে পদে পদে ঠকেছে। কিছু মানুষ নিজেদের আখের গুছিয়ে নিয়েছিল উদ্বাস্তু মানুষদের ঠকিয়ে। মানুষের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে স্বার্থলোভী কিছু মানুষ

মুনাফা লুটে গেছে নির্দয়ভাবে। উদ্বাস্তু মানুষগুলো সবাই নিজেদের পরিচয়, নিজেদের পেশা, নিজেদের বিশ্বাস, নিজেদের সংস্কার সমস্ত কিছু বিসর্জন দিয়ে শুধু বেঁচে থাকার লড়াইয়ে টিকে থাকতে চেয়েছে। এ প্রসঙ্গে হেনা সিনহা বলেছেন-

> "এদেশে এসে ছিন্নমূল মানুষগুলি কোনক্রমে বাঁচতে চেয়েছে। তাই অতীতের সামাজিক ও পারিবারিক মর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে নারী পুরুষ সকলেই বাঁচার জন্য যেকোনো জীবিকাকে গ্রহণ করেছে। এমনকি দৈহিক শুচিতা বিসর্জন দিতেও তারা পিছপা হয়নি।"[৬]

দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের নিয়ে লিখিত উপন্যাসের সংখ্যা অনেক। কোনো কোনো রচনা দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদেরকে নিয়ে লেখা আর কোনো কোনো রচনায় প্রসঙ্গক্রমে একটু-আধটু উঠে এসেছে দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা। রমেশচন্দ্র সেনের(১৮৯৫-১৯৬২) 'পূর্ব থেকে পশ্চিমে', জীবনানন্দ দাশের(১৮৯৯-১৯৫৪) 'জলপাইহাটি'(১৯৪৮), 'বাসমতীর উপাখ্যান'(১৯৪৮), তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৮৯৯-১৯৭১) 'বিপাশা'(১৯৫৮), বনফুলের(১৮৯৯-১৯৭৯) 'পঞ্চপর্ব'(১৯৫৫) ও 'ত্রিবর্ণ'(১৯৬৩), প্রবোধকুমার সান্যালের(১৯০৫-১৯৫৩) 'হাসুবানু'(১৯৫২), অমরেন্দ্র ঘোষের(১৯০৭-১৯৬২) 'ভাঙছে শুধু ভাঙছে'(১৯৫০), 'মন্থন'(১৯৫৪), 'ঠিকানাবদল'(১৯৫৭), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯০৮-১৯৫৬) 'সার্বজনীন'(১৯৫২), প্রতিভা বসুর(১৯১৫-২০০৬) 'সমুদ্র হৃদয়'(১৯৫৯), নরেন্দ্রনাথ মিত্রের(১৯১৬-১৯৭৫) 'উপনগর'(১৯৬৩) ও 'মহানগর'(১৯৬৩), নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের(১৯১৭-১৯৭০) 'বিদিশা'(১৯৫৪), অচ্যুত গোস্বামীর(১৯১৮-১৯৮০) 'কানাগলির কাহিনী'(১৯৫৫), অমিয়ভূষণ মজুমদারের(১৯১৮-২০০১) 'নির্বাস'(১৯৫৯), নারায়ণ সান্যালের(১৯২৪-২০০৫) 'বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প'(১৯৫৫), সমরেশ বসুর(১৯২৪-১৯৮৮) 'সুচাঁদের স্বদেশযাত্রা'(১৯৬৯)। এছাড়াও 'সওদাগর'(১৯৭১) ও 'খণ্ডিতা'(১৯৭৮), শঙ্খ ঘোষের(১৯৩২-২০২১) 'সুপুরিবনের সারি'(১৯৯০), সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের(১৯৩৪-২০১২) 'অর্জুন'(১৯৭১), প্রফুল্ল রায়ের(১৯৩৪-) 'কেয়া পাতার নৌকা'(১৯৭০), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের(১৯৩৪-২০১৯) 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে'(১৯৭১), সেলিনা হোসেনের(১৯৪৭-) 'গায়ত্রী সন্ধ্যা'(১৯৯৪), তসলিমা নাসরিনের(১৯৬২-) 'লজ্জা'(১৯৯৩), 'ফেরা'(১৯৯৩) ইত্যাদি।

শক্তিপদ রাজগুরুর 'দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' উপন্যাসটি দেশভাগ ও উদ্বাস্তু দিন নিয়ে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য উপন্যাস। এছাড়াও 'তবু বিহঙ্গ', 'চেনামুখ', 'ঘরের ঠিকানা' প্রভৃতি উপন্যাসে তিনি দেশভাগ ও উদ্বাস্তু সমস্যা দেখিয়েছেন। শক্তিপদ রাজগুরুর কথাসাহিত্যের একটি অন্যতম ধারাই হলো রিফিউজি কলোনির জীবনযাত্রার ছবি। 'দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' উপন্যাসটি আবু রুশদের 'নোঙর' উপন্যাসের উল্টো ঘটনা নিয়ে লিখিত। দেশভাগের পর কলকাতা থেকে মুসলিমদের ঢাকা যাওয়াটা যতটা বাধ্যতামূলক ছিল তার থেকে অনেক বেশি বাধ্যতামূলক ছিল

পূর্ববঙ্গ থেকে হিন্দুদের এ দেশে আসা। স্বাধীনতার পর পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের মধ্যে খুব কম সংখ্যকই সখ করে কলকাতায় আসে, বেশির ভাগই আসে প্রাণের দায়ে। যে সমস্ত হিন্দুরা পিতৃপুরুষের ভিটে আগলে বসেছিল, আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল দেশ না ছাড়তে তারাও শেষ পর্যন্ত পারেনি। হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ এগুলি নিরলসভাবেই চলতে থাকে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতির কথা বলেছেন সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-

> "নির্যাতনের নিষ্ঠুরতা ছিল অকল্পনীয়। এক সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তু আরেক সম্প্রদায়ের উদ্বাস্তুকে আক্রমণ করছে; নারী লুণ্ঠন হয়েছে নির্বিচারে, কোলে শিশু জননীও রেহাই পাননি সেই উন্মুক্ত আক্রমণ থেকে। অনেক অশ্রু রক্তের বিনিময়ে পাওয়া স্বাধীনতা ক্রমশই বিষাদ হয়ে যাচ্ছিল মানুষের কাছে। স্বাধীনতা এসেছে, দেশভাগ হয়েছে অথচ দাঙ্গা রক্তপাতের বিরাম নেই।"[৭]

এই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে নিজেদের জীবন বাঁচাতে 'দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' উপন্যাসের নিরীহ মানুষগুলো এসেছে এদেশে। সেই অসহায় মানুষগুলোর জীবনসংগ্রামই হলো উপন্যাসের মূল উপজীব্য। মানুষগুলো ছিল নিষ্পাপ সহজ-সরল, রাজনীতির স্পর্শের বাইরে এরা, বুঝেনা নিজেদের আখের গোছানো। সেই মানুষগুলোর চাহিদাও ছিল অতি সামান্য। বেঁচে থাকার জন্য সামান্য অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানই তাদের কাম্য ছিলো। মানুষগুলো কীভাবে স্বার্থন্বেষী মানুষদের দাবার গুটি হয়ে গেল, তাই এই উপন্যাসে উদ্ভাসিত হয়েছে-

> "এই রোদে তবু মানুষের ভিড় এখানে থিক থিক করছে। ছেঁড়া ময়লা কাপড় পরা মেয়ে পুরুষের দল লাইন দিয়েছে। ডোল অফিসের সামনে আধ ন্যাংটা ছেলে মেয়ের দল কলরব করে। মুখে চোখে এদের শীর্ণতার ছাপ। যেন অবাঞ্ছিত ওরাই নিজেরা বেঁচে আছে নিজেদের অফুরান প্রাণশক্তি নিয়ে অভিশাপের মতো।"[৮]

তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়ের পরিকল্পনায় 'দণ্ডকারণ্য ডেভেলপমেন্ট অথরিটি' সংস্থা করা হয় এবং উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে পাঠানো হয়। সরকার উদ্বাস্তুদের ভালো করতে চেয়েছিল কিন্তু কিছু স্বার্থলোভী মানুষের জন্য উদ্বাস্তুদের জীবন নরকে পরিণত হয়। তাদের সাপ্তাহিক কিছু চাল গম ও সামান্য কিছু সাহায্য দিয়ে ভিখারির মতো জীবন যাপনে বাধ্য করা হয়। মধ্যপ্রদেশের রামপুরের কাছে উদ্বাস্তু ক্যাম্পের মানুষের কঠোর জীবনসংগ্রামের কথা ফুটে উঠেছে আলোচ্য উপন্যাসে। তাদের দুর্দশার ও লাঞ্ছনার জন্য দায়ী সেই স্বার্থপর নেতারা, যারা দেশভাগের পরিণামের কথা না ভেবেই, সাধারণ মানুষের দুর্দশার কথা না ভেবেই শুধু ক্ষমতার লোভে দেশকে ভেঙেছিল আর দায়ী কিছু স্বার্থপর উদ্বাস্তু মানুষ, যারা বিপদেও একে অপরের পাশে থাকেনা। অভাবের সুযোগ নিয়ে সুধাকান্ত, গিরিজা, পটলা, চৈৎসিং প্রভৃতির মতো দুর্বৃত্তরা মেয়েদের দিয়ে জোর করে দেহ

ব্যবসা করিয়ে নেয়। সহজ-সরল মেয়েগুলোর পেটের ক্ষুধাকে হাতিয়ার করে তাদের জীবনের চরম সর্বনাশ করে দেয়-

> "খেতু বাবু দাবড়া দু'হাত দিয়ে কেতকীকে তার লোমশ বুকের উপর টেনে নিয়ে বলে- আজ বাসমতী চাল আর এক নম্বর ডাল দেব। কেতকীর গায়ে মুখে লাগছে লোকটার উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। ওর হাতদুটো থেকে টানছে নির্জন গুদাম ঘরের দিকে। কেতকী পুরুষদের মনের বাড়টাকে দেখেছে, গিরিজা, কালু, দুই নম্বরের সতীশ রায়, ক্ষুদিরাম হোমিওপ্যাথকেও দেখেছে, সবাই যেন হামলে পড়ে খেতে চায়।"[৯]

একটু চাল, চিনির বিনিময়ে বা একটা কাপড়ের বিনিময় কেতকীর মতো শত শত বাচ্চা মেয়েরা কালু, খেতু বাবুর মতো বুড়দের অত্যাচার সহ্য করে যায়।

একের পর এক ক্যাম্পে গিয়েছে অসহায় মানুষগুলো কিন্তু তারা সুখের দেখা পায়নি। একের পর এক সবকিছুকে হারিয়েছে শুধু। মেয়েরা সম্মান হারিয়েছে, মায়ের কোল খালি হয়েছে, স্ত্রী স্বামী হারিয়েছে, বদলে পায়নি কিছুই। নালিশ জানানোর কেউ নেই। নেতা-মন্ত্রী অবধি পৌঁছায় না এদের হাহাকার, তাই এদের নালিশ ভগবানের প্রতি-

> "সুরভি বলে- কান্দিস ক্যান যমুনা! চোখের জল আমাগোর পাথর হই গেছে। ওই ঘর বাঁধার স্বপ্ন দ্যাখা ভুলই করছিলি তুই, ঘর আমাগোর বরাতে নাই, ভালবাসতি আমাগোর ভুলাই দিছে হেই মুখপোড়া ভগবান।"[১০]

কিন্তু এই মানুষগুলোর জীবনসংগ্রামের কথা কেউ মনে রাখবেনা। ইতিহাসে শুধু লেখা থাকবে তাদের কথা, যারা দেশভাগ করেছিল, দেশভাগের পর যারা মানুষকে দেশ-মাটি থেকে উৎখাত করেছিল তাদের কথা। এই যে হাজার হাজার মানুষ নিজের দেশ থেকে, জন্মভূমি থেকে বিতাড়িত হয়ে আশা-ভালোবাসা, মান-সম্মান, স্বপ্ন-আপনজন, মনুষ্যত্ব সমস্ত কিছুই হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে এক ঘাট থেকে আরেক ঘাটে ঘুরছে। এর জন্য দায়ী কে? এই প্রশ্নই কেউ কখনো ভুলবে না। সেই ছিন্নমূল হাজার হাজার মানুষ, যারা প্রতিনিয়ত লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন, তাদের প্রতিনিধি হলো আলোচ্য উপন্যাসের চরিত্রেরা সুরভি, যমুনা, কালু, গিরিজা, কেতকী, পটলা, ললিতা।

আমরা আবু রুশদের 'নোঙর' ও শক্তিপদ রাজগুরুর 'দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি' উপন্যাসটি পাশাপাশি আলোচনা করে দেখি, তাহলে দেখতে পাবো 'নোঙর' এর তুলনায় শতগুণ বেশি যন্ত্রণা কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে পাকিস্তান থেকে এদেশে আসা উদ্বাস্তু মানুষদের। তবে কলকাতায় যে মুসলিমরা অত্যাচারিত হয়নি তা নয় বা এটাও সত্যি নয় মুসলিমদের কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় গিয়ে বসতি করতে অসুবিধা হয়নি কিন্তু পাকিস্তানের হিন্দুরা সহস্রগুণ বেশি অত্যাচারিত হয়েছে, সহস্রগুণ বেশি মানুষ পাকিস্তান ছেড়ে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসেছে, এ দেশে এসেও তাদের সহস্রগুণ বেশি কষ্ট ভোগ করতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে হেনা সিনহা যথার্থ মন্তব্য করেছেন-

"পাকিস্তানের সংখ্যালঘুদের সমস্ত রকম নিরাপত্তার আশ্বাস দেওয়া হলেও তা প্রশাসনের দিক থেকে রক্ষিত হয়নি। নিরাপত্তাহীনতার জন্য দেশভাগের পর দলে দলে হিন্দু ও শিখ পাকিস্তান ছেড়ে ভারতে চলে আসতে লাগলেন।

অপরপক্ষে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য ভারত সরকারের পক্ষ থেকে যথাসাধ্য নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারতীয় মুসলিমরা যে একেবারেই অত্যাচারিত হননি, তা নয় তবে তুলনায় অনেক কম।"[১১]

আমরা শেষে একথা বলতে পারি হিন্দু হোক বা মুসলিম দেশভাগের যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল সবাইকেই। এদেশ ছেড়ে মুসলিমদের পাকিস্থানের যাওয়া বা পাকিস্তান থেকে হিন্দুদের আসা সবাইকেই সহ্য করতে হয়েছিল কঠিন কষ্ট ও লাঞ্ছনা, তবে সেটা একটু কম আর বেশি। এপার বাংলা ওপার বাংলা হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে অনেক সাহিত্যিকদের রচনা দেশভাগ ও উদ্বাস্তুদের এই ছবি জীবন্তভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে শক্তিপদ রাজগুরুর অপর একটি উপন্যাস 'তবু বিহঙ্গ'(১৯৬০)। উপন্যাসের পটভূমি রাঢ়বঙ্গ, বর্ধমানের দুর্গাপুরের গোয়িলপুর গ্রাম ও দামোদর নদীর তীরে উদ্বাস্তু শিবির মানুষের কথা। ড: শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথায়-

"শক্তিপদ রাজগুরু 'তবু বিহঙ্গ' পশ্চিম রাঢ়ে বনভূমির প্রান্ত উষর প্রান্তরে গড়িয়া ওঠা উদ্বাস্তু শিবির জীবনে একটি স্পষ্ট হৃদয়ের নানা চমকপ্রদ পরিচয় বিচিত্র কাহিনী। ...মানব চরিত্রের কি বিচিত্ররূপ, ভালো-মন্দের কি অদ্ভুত মিশ্রণ, তীর্যক মনোবিকারের কি স্মরণীয় রেখাচিত্রই না এই উদ্বাস্তু পরিবারগুলির সমষ্টিগত সংকীর্ণ জীবন পরিধির মধ্যে উদাহৃত হইয়াছে।"[১২]

উপন্যাসের মানুষগুলোর মনুষ্যত্ব কেমনভাবে যেন ফুরিয়ে গেছে। উদ্বাস্তু তকমা লাগার সঙ্গে সঙ্গে মানুষগুলোও কেমনভাবে যেন বদলে গেছে। মুরারি সিদ্ধান্ত 'তবু বিহঙ্গ' উপন্যাসের সবথেকে হিংস্র চরিত্র। পনেরো বিঘা জমির জন্য সে নিজের মেয়ে নির্মলার সতীত্বকেও নিলামে ছড়িয়ে দেয়। কপিলের স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে গেলে কপিল তবু নতুন বাঁচার স্বপ্নে বিভোর হয়। স্বৈরিনী কমলের মধ্যেও মাতৃত্বের ক্ষুধা জেগে ওঠে। উদ্বাস্তু মানুষগুলোর মধ্যে ভালো-খারাপ সবাই আছে। হাতুড়ে ডাক্তার জিতেন যেমন সুবিধাবাদী, শয়তান তেমনি নিকুঞ্জবাবু সৎ, নির্লোভ। সে উদ্বাস্তু কলোনির মানুষের ন্যায্য অধিকারের জন্য লড়ে যায়। উদ্বাস্তু ক্যাম্পের বাসন্তীকে ভালোবেসে ফেলে নিকুঞ্জ। উদ্বাস্তুদের জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা দেখানোর পাশাপাশি ক্যাম্পের মানুষের সুখ-আনন্দ, প্রেম-ভালোবাসা সমস্ত কিছুকেই দেখিয়েছেন ঔপন্যাসিক। উপন্যাসটিতে আরও দেখানো হয়েছে জমিদারি প্রথার বিলোপের সাথে সাথে সময়ের গতিশীলতায় ভাসমান উদ্বাস্তু জীবনের দৃঢ়ভূমি পাওয়ার সংগ্রামী ইতিহাস। মানুষগুলো প্রথম থেকে অনেক অত্যাচার, শোষণ, অবহেলা

ও লাঞ্ছনা সহ্য করেছে। সহ্য করতে করতে একসময় প্রতিবাদী হয়ে ওঠে অনেকেই। অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে দাবি করে তাদের ন্যায্য পাওনা।

ঔপন্যাসিক এখানে দুটো প্রতীক ব্যবহার করেছেন। উপন্যাসটি রবীন্দ্র সংগীত 'ওরে বিহঙ্গ মোর' দিয়ে শুরু, পাখিদের বাসার মতো মানুষের জীবন বাসস্থান ঔপন্যাসিক এই ইঙ্গিত দিতে চেয়েছেন। ক্যাম্পের মধ্যে বিচিত্র মানুষের কথা বলার মধ্যে দিয়ে একবার লেখক ক্যাম্পের হাজার রকম মানসিকতার মানুষের সাথে যেন সমাজের হাজার রকমের মানুষের একটা তুলনা করেছেন।

উদ্বাস্তুদের নিয়ে শক্তিপদ রাজগুরুর সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস হলো 'মেঘে ঢাকা তারা'। ১৯৫৬ সালে উল্টোরথ পত্রিকায় 'চেনামুখ' বলে একটি বড়গল্প প্রকাশিত হয়। এই গল্প থেকেই সিনেমা হয় 'মেঘে ঢাকা তারা'। পরবর্তীকালে বড়গল্পটি 'মেঘে ঢাকা তারা' নামে একটি সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাসে পরিণত হয়। অনেক মানুষের বদলে এখানে উদ্বাস্তুদের প্রতিনিধিত্ব করেছে একটি উদ্বাস্তু ব্রাহ্মণ পরিবার। পীরগঞ্জ থেকে মাধব বাবু নামে একজন স্কুল মাস্টার চারটি ছেলে মেয়ে ও স্ত্রীর হাত ধরে এসে আশ্রয় নেয় এপার বাংলায়। বড়ো মেয়ে নীতার শুরু হয় পরিবারকে বাঁচানোর লড়াই। চাকরি, টিউশনি করে সে বাবা-মা-ভাই-বোন ও ভালবাসার মানুষদের মুখে হাসি ফোটাতে চেয়েছিল। উদ্বাস্তু নীতার একার সংগ্রামই যেন হয়ে উঠেছে সমস্ত উদ্বাস্তু মেয়েদের সংগ্রাম, যারা কোনো অবস্থাতেই নিজের মান-সম্মান খুইতে নারাজ। সৎপথে প্রাণপাত পরিশ্রম করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চেয়েছিল। সেই পথ যে কতটা কঠিন ছিল তা আমরা নীতার জীবন সংগ্রাম দেখলেই বুঝতে পারি। সর্বস্ব খুইয়ে উদ্বাস্তু হয়ে এদেশে এসে বাবার পক্ষে নতুন করে আর কিছু সম্ভব হচ্ছিল না কিন্তু ভাই বোনদের পড়াশোনার কোনো ক্ষতি হতে দেয়নি নীতা, কারণ তার মনে হয়েছে বড়ো মেয়ে হিসেবে বাবার পাশে দাঁড়ানো তার একান্ত কর্তব্য।

একদিন নীতার স্বপ্ন সত্যি হয়েছে, বাবার বই বাজারে নাম করেছে, মায়ের স্বপ্নের বাড়ি তৈরি হচ্ছে, দাদার গানের জগতে নাম হয়েছে, ছোট ভাই চাকরি পেয়েছে, ছোট বোনের ভালো বিয়ে হয়েছে, ভালোবাসার মানুষ সনৎ এম.এ পাশ করে চাকরি পেয়েছে কিন্তু সেই দিন নীতার খবর কেউ রাখে নি। তবে দাদা শংকর শুধু নীতার দুঃখকে বুঝতে পেরেছিল। অথচ নীতার একজন নারী, তারও মন ছিল, চোখে স্বপ্ন ছিল, ঘরবাঁধার ইচ্ছে ছিল, ভালোবাসার মানুষকে কাছে পাওয়ার আকুলতা ছিল। নীতাও অকপটে স্বীকার করেছিল সে কথা-

> "আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম সনৎ। মেয়েরা সকলেই যা চায় আমিও তাই চেয়েছিলাম।"[১৩]

সবার কথা ভাবতে গিয়ে নীতা নিজের কথা ভাবেনি, অক্লান্ত পরিশ্রম করে সে যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে শিলংয়ের চলে গেলে তার জন্য কারো জীবনের কোনো ছন্দই নষ্ট হয়নি। সনৎকে সে প্রাণাধিক ভালোবেসেছিল, যার হাত খরচের টাকা থেকে পড়াশোনার টাকা ও অনুপ্রেরণা সমস্ত

কিছুই সে অক্লান্তভাবে জুগিয়ে ছিল, কিন্তু সেই সনৎ যখন নীতার চোখের সামনে গীতাকে বিয়ে করলো নীতা এটা আর সহ্য করতে পারলো না। তাই হয়তো ভেঙে পড়ল তার শরীর, অকালে ঝরে গেল একটি পবিত্র প্রাণ।

শক্তিপদ রাজগুরু নিজে উদ্বাস্তুদের ক্যাম্পে ঘুরে তাদের জীবনযন্ত্রণা, দুঃখ-কষ্ট, হতাশা নিজে চোখে দেখে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করে পরে সেগুলি সাহিত্যে লিপিবদ্ধ করেছেন বলেই উদ্বাস্তু না হয়েও উদ্বাস্তুদের নিয়ে লেখাগুলো এত জীবন্ত। তিনি সমস্ত উপন্যাসগুলিতেই উদ্বাস্তুদের যন্ত্রনা, কষ্ট এগুলোকে বাস্তবসম্মতভাবেই ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশ থেকে উৎখাত, ক্যাম্পের বর্ণনা এগুলো এত জীবন্ত যে আমাদের মনে হয় ঔপন্যাসিক নিজেও হয়তো পাকিস্তান থেকে এদেশে এসে ক্যাম্পে থেকেছেন। তবে শক্তিপদ রাজগুরুর লেখার একটি বৈশিষ্ট্য হলো জীবনের জয়গান গাওয়া। শত কষ্টের মধ্যেও তার সৃষ্ট চরিত্রের হাসে। শত যন্ত্রণার মধ্যে থেকেও তাঁর উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীরা স্বপ্ন দেখে। শত বিপত্তির মধ্যে থেকেও উপন্যাসের চরিত্রের আশা রাখে ভবিষ্যতে ভালো কিছু হবে। উদ্বাস্তু মানুষগুলোর তো দুঃখ-কষ্ট, বঞ্চনা ও লাঞ্ছনার কোনো শেষ নেই। তবু তারা হাসে, ভালোবাসে, বিয়ের স্বপ্ন দেখে, মা হতে চায়, বাবা ডাক শুনতে চায়। এক ক্যাম্প থেকে আরেক ক্যাম্পে যখন তারা যায় তখন তারা ভাবে নিশ্চয় এই ক্যাম্পে ভালো কিছু হবে। শত কষ্টেও তারা নিরাশ হয় না। শত দুঃখে ও তারা জীবনের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় না-

"নৌকাগুলো ভেসে চলেছে জোয়ারের বেগে।

ভেসে চলেছে ছাত্রভঙ্গ মানুষের দল। কোথায় চলেছে আবার বানে ভাসা খড়কুটোর মতো আশ্রয়ের আশায় তা তারাও জানেনা। দূর দিগন্তে ভেসে ভেসে ওঠা হারিয়ে গেল সেই অজানা জগতের সন্ধানে যেখানে আবার ওরা ঘর বাঁধবে।"[১৪]

তথ্যসূত্র

১. কুমাররীত প্রত্যুষ, 'রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন ও ভান্ডার পত্রিকা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, অক্টোবর ২০১২, পৃষ্ঠা: ৩২-৩৩।

২. কুঞ্জ ড: চন্দন কুমার, 'ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ বাংলা উপন্যাসের দর্পণে', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১২, পৃষ্ঠা: ৬৭।

৩. কুঞ্জ ড: চন্দন কুমার, 'ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ বাংলা উপন্যাসের দর্পণে', তদেব, পৃষ্ঠা: ৭৩।

৪. সেন মণিকুন্তলা, 'সেদিনের কথা', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২, পৃষ্ঠা: ১৮১।

৫. সিনহা হেনা, 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ভগ্ননীড়ের বেদনা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃষ্ঠা: ১০।

৬. সিনহা হেনা, 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ভগ্ননীড়ের বেদনা', তদেব, পৃষ্ঠা: ১৫।

৭. বন্দোপাধ্যায় সন্দীপ, 'দেশভাগ-দেশত্যাগ', অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯৪, পৃষ্ঠা: ৪১।

৮. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'('দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'), যূথিকা বুক স্টল, সত্যনারায়ণ প্রকাশন, কলকাতা, বইমেলা ২০০৮, পৃষ্ঠা: ১।

৯. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'('দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'), তদেব, পৃষ্ঠা: ১১।

১০. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'('দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'), তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩৫।

১১. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'('দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'), তদেব, পৃষ্ঠা: ২১০।

১২. বন্দোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, পুনঃমুদ্রণ ২০০৬- ০৭, পৃষ্ঠা: ৭১২।

১৩. রাজগুরু শক্তিপদ, 'পাঁচটি উপন্যাস'('মেঘে ঢাকা তারা'), দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা: ১২০।

১৪. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'('দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'), তদেব, পৃষ্ঠা: ১৩৬।

গ্রন্থপঞ্জি

আকরগ্রন্থ

১. রাজগুরু শক্তিপদ, 'সেরা দশটি উপন্যাস'('দন্ডক থেকে মরিচঝাঁপি'), যূথিকা বুক স্টল, সত্যনারায়ণ প্রকাশন, কলকাতা, বইমেলা ২০০৮।

২. রাজগুরু শক্তিপদ, 'পাঁচটি উপন্যাস'('মেঘে ঢাকা তারা'), দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন ১৪১৭ বঙ্গাব্দ।

সহায়ক গ্রন্থ

১. বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রী শ্রীকুমার, 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা, সপ্তম সংস্করণ, পুনঃমুদ্রণ ২০০৬- ০৭।

২. চট্টোপাধ্যায় তপনকুমার, 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস', প্রজ্ঞা বিকাশ, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, ২০০৪ ।

৩. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের প্রতিমা', দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০১৪ ।

৪. গুপ্ত ক্ষেত্র, 'বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস', গ্রন্থনিলয়, কলকাতা, মার্চ ২০০০ ।

৫. মুখোপাধ্যায় অরুণকুমার, 'কালের পুত্তলিকা (তৃতীয় খণ্ড), দে'জ পাবলিশার্স, কলকাতা, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর ২০১৬ ।

৬. আচার্য অনিল, 'সত্তর দশক', অনুষ্টুপ, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৪ ।

৭. ভট্টাচার্য দেবীপ্রসাদ, 'উপন্যাসের কথা ', দে,'জ পাবলিশিং, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০৩ ।

৮. ঘটক ঋত্বিককুমার, 'চলচ্চিত্র মানুষ এবং আরও কিছু', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুলাই, ২০১৮ ।

৯. চক্রবর্তী সুমিতা, 'উপন্যাসের বর্ণমালা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ২০১৬ ।

১০. ভট্টাচার্য হংসনারায়ন, 'বঙ্গসাহিত্যবিধান', ফার্মা কে.এল.এম. প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৯ ।

১১. পাল বাবুলকুমার, 'বরিশাল থেকে দণ্ডকারণ্য', গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, এপ্রিল ২০১০ ।

১২. কুমাররীত প্রত্যুষ, 'রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলন ও ভান্ডার পত্রিকা', পুস্তক বিপণি, কলকাতা, অক্টোবর ২০১২।

১৩. কুণ্ড ড: চন্দন কুমার, 'ছেচল্লিশের দাঙ্গা ও দেশভাগ বাংলা উপন্যাসের দর্পণে', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১২।

১৪. সেন মণিকুন্তলা, 'সেদিনের কথা', নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮২।

১৫. সিনহা হেনা, 'বাংলা উপন্যাসে দেশভাগ ভগ্ননীড়ের বেদনা', বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা০৯, প্রথম প্রকাশ ২০১০।

১৬. বন্দোপাধ্যায় সন্দীপ, 'দেশভাগ-দেশত্যাগ', অনুষ্টুপ, কলকাতা ১৯৯৪।